আত্মহত্যাঃ একটি মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

“শোনা গেল লাশকাটা ঘরে

নিয়ে গেছে তারে;

কাল রাতে, ফাল্গুনের রাতের আঁধারে

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ

মরিবার হলো তার সাধ।”. . . . . জীবনানদাশ

কবিতার ছত্রগুলো তার লেখকের মতোই যেন কষ্টে নীল হয়ে আছে। ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়। লিখা সড়েনা। যে গেল সে গেল, যারা রইলো তাদের মনে পাথরের বোঝা।

মানুষ যখন নিজেই নিজের মৃত্যু ঘটায় তাই হলো আত্মহত্যা বা সুইসাইড। আবার কিছু মানুষ আছে যারা নিজেকে কাটে বা নিজের ক্ষতি করে, কিন্তু তাদের আসলে মৃত্যুবরণ করার কোন প্রকৃত ইচ্ছা নেই। একে বলে প্যারাসুইসাইড।

স্ক্যান্ডিনিভিয়া, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, পূর্ব ইউরোপের দেশ সমূহ এবং জাপানে আত্মহত্যার হার সর্বোচ্চ (লাখে পঁচিশের উপরে)। গত পঞ্চাশ বছরে সারা পৃথিবীতে, মূলতঃ উন্নয়ণশীল দেশগুলোতে আত্মহত্যার হার শতকরা ষাট ভাগ বেড়েছে। সারাপৃথিবীর যত মানুষ আত্মহত্যার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করে তার মধ্যে ২.০৬% বাংলাদেশী। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রতি লাখে ১২৮.০৮ জন মানুষ আত্মহত্যা করে। প্রতি বছর এই সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশে প্রতিদিন ২৮ জন মানুষ আত্মহত্যা করে।

বাংলাদেশে কীটনাশক পান, ইঁদুর মারার বীষ পান, ফাঁসী, ঘুম বা ব্যাথার ঔষধ. হারপিক, স্যাভলন ইত্যাদি বিষাক্ত তরল পান করার মাধ্যমে মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে। অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশী দেখা যায়।

আত্মহত্যার ধরণেও রয়েছে বৈচিত্র্য। কেউ নিজেই নিজের জীবন নিয়ে নেয়। আবার কেউ এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে চুক্তি করে একসঙ্গে আত্মহত্যা করে। একে বলে প্যাক্ট সুইসাইড। কখনো কখনো দলের চাপে অনেকে একসাথে আত্মহত্যা করে। একে বলে ম্যাস সুইসাইড। জিম জোনস নামের এক ধর্মগুরুর নেতৃত্বে ১৯৭৮ সালের ১৮ নভেম্বরে জোনস টাউন নামের একটি কমিউনিটিতে ৯০৯ জন মার্কিন নাগরিক ম্যাস সুইসাইডের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করেন। কোন কোন সমাজে সম্মান রক্ষার জন্য আত্মহত্যার চল ছিল। একে বলে অনার সুইসাইড। জাপানের সামুরাইরা নিজের পেট কেটে আত্মহত্যা করতো। একে বলা হতো সেপুকু (Seppuku)। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা অনেক সময় বড় ধরণের অপরাধ করার পর আত্মহত্যা করার মাধ্যমে বিচার ও অসম্মানিত হওয়া থেকে নিজেদের ও নিজেদের পরিবারকে বাঁচাতেন। একে বলে ডিউটিফুল আত্মহত্যা। গ্রীক সম্রাট নিরো এবং জার্মান সেনাপতি এরউইন রোমেল এই প্রক্রিয়ায় আত্মহত্যা করেছিলেন। অনেক সময় যিনি আত্মহত্যা করতে চান তার শারীরিক স্বক্ষমতার অভাব বা সাহসের অভাব থাকায় তিনি অন্য কারো সাহায্য নিয়ে আত্মহত্যা করেন। একে বলে ইউথানসিয়া (Euthanasia)। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এই ধরণের আত্মহত্যা বৈধ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তার জ্যাক কোভোকিয়ান (Jack Kevorkian) আত্মহত্যায় সহায়তা করার জন্য একটি মেশিন বানিয়ে বহুসংখ্যক মানুষকে আত্মহত্যা করতে সাহায্য করে ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছিলেন। উনি নিজে অবশ্য কিছুদিন কারাভোগ করে বহাল তবিয়তে তিরাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। অনেক সময় নিজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রভাবিত হয়ে আত্মহত্যার সময়ে নিজের ভালোবাসার মানুষদেরকে হত্যা করে তারপর কেউ কেউ আত্মহত্যা করেন। একে বলা হয় মার্ডার সুইসাইড (ভিন্নমতে মার্সি কিলিং)। বিডি নিউজ টুয়েন্টি ফোর ডট কমের ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ -র প্রকাশনায় দেখা যায় বরগুনার এক মা আত্মহত্যার পূর্বে তার তিন ও পাঁচ বছরের দুটি সন্তানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন। কোন আদর্শ দ্বারা

পরিচালিত অন্য মানুষদের হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য কেউ কেউ অন্যদের মেরে নিজেও মারা যায়। একে বলে সুইসাইড অ্যাটাক। ২৯ নভেম্বর ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশেল চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে সুইসাইড বম্বিং এ দশ জনের মতো মানুষ মৃত্যুবরণ করে ও আরো বহু মানুষ হতাহত হয়। (উইকিনিউজ, ২৯ নভেম্বর, ২০০৫)। কখনো কখনো আদর্শগত প্রচারণা ও প্রতিবাদ করার জন্য নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটে। চীনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসাবে তিব্বতের কিছু মানুষ এমনটা করেছে।

কেন এই আত্মহনন?

কেন মনুষ নিজের জীবন নিজে নেয়? তার কি তখন মাথার ঠিক থাকে? সুস্থ মাথায় কি এটা করা সম্ভব? নানা ধরণের ব্যাখ্যা দেখা যায়।

- মানসিক রোগীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশী থাকে। যেমন, বিষন্নতা, বাইপোলার মুড ডিজঅরডার, সিজোফ্রেনিয়া, পারসোনালিটি ডিজঅরডার, মাদকাসক্ত, উদ্বেগে আক্রান্ত ইত্যাদি রোগীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার উচ্চ। বিষন্নতার রোগীদের মধ্যে একধরণের তীব্র আশাহীনতা তৈরী হয়। দুনিয়ার সব কিছু তারা নেতিবাচকভাবে দেখে। তারা নিজের সম্পর্কে, ভবিষ্যত সম্পর্কে ও অন্য মানুষদের সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা পোষণ করে। তারা ভাবে এই পরিস্থিতি দিন দিন আরো খারাপ হবে ও এটি পরিবর্তনের জন্য শত চেষ্টাতেও কোন লাভ হবেনা। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় নিজেকে মেরে ফেলা। এই চিন্তায় তাড়িত হয়ে তারা আত্মহত্যা করে। অনেক বিষন্নতার রোগী খামোখাই তীব্র অপরাধবোধে ভুগে। ফলে নিজেকে শাস্তি দিতেই তারা আত্মহত্যা করে। কগনিটিভ সাইকোথেরাপির জনক অ্যারন টি বেকের তত্ব পড়লে আমরা আত্মহত্যার বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারি।

-অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে আত্মহত্যার হার বেড়ে যায়। ইন্ডিয়াতে খড়ার ও শস্যহানির কারণে কৃষকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার অনেক বেশী। ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪ সালে ৫৬৫০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। ইন্ডিয়াতে প্রতি লাখে ১.৪ থেকে ১.৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করে। সমাজে যখন বিশৃঙ্খলা তৈরী হয়, যখন মানুষ বিচ্ছিন্নতায় ভুগে, তখন আত্মহত্যার হারও যায বেড়ে।

-রাজনৈতিক আদর্শের কারণে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। যেমন, আত্মঘাতি বোমা হামলাকরীরা করে থাকে।

-অনেকে বাধ্য হয়েও আত্মহত্যা করে। যেমন, বন্দীশিবিরের তীব্র নির্যাতন সইতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যা করেন।

- সম্মান রক্ষার জন্য কোন কোন সমাজে আত্মহত্যার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। যেমন, জাপানের সামুরাই যোদ্ধারা আত্মহত্যা করতো। আবার বড় বড় পদে থাকা ক্ষমতাশালী মানুষদের মধ্যে পরিস্থিতির চাপে অন্য কোন উপায় না থাকায় আত্মহত্যা করার বিষয়টি চোখে পড়ে।

- দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীরা অনেক সময় আত্মহত্যা করে। অসুখের তীব্র যন্ত্রণা সইতে না পেরে অনেকে এই পথ বেছে নেয়।

- বাংলাদেশে পরিচালিত এক গবেষণায় পারিবারিক সমস্যা (৪১.২%), পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া (১১.৮%), বৈবাহিক সমস্যা (১১.৮%), ভালোবাসায় কষ্ট পাওয়া (১১.৮%). বিবাহ বহির্ভূত গর্ভধারণ ও যৌন সম্পর্ক (১১.৮%), স্বামীর নির্যাতন (৫.৯%) এবং আর্থিক দৈন্যতাকে (৫.৯%) আত্মহত্যার চেষ্টার সাথে জড়িত বলে পাওয়া গেছে (আলী এবং সহযোগীবৃন্দ, ২০০৫)।

- কোন কোন পেশার মানুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশী দেখা যায়। যেমন, ডাক্তার, ডেন্টিস্ট বা দন্ত বিশেষজ্ঞ, পুলিশ বা স্বশস্ত্র বাহিনীর লোক ইত্যাদি।

- মন:সমীক্ষণের জনক সীগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে যখন ভালোবাসার মানুষের প্রতি সৃষ্ট তীব্র রাগ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব নিজের প্রতি ধাবিত হয় তখন মানুষ আত্মহত্যা করে। অন্যকে হত্যা করার সুপ্ত কামনা যখন অবদমিত হয় তখন সেটা আত্মহত্যার দিকে ধাবিত

হয়। মানুষের মধ্যে একটি শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, আর আরেকটি তাকে ধ্বংস করে ফেলতে চায় । এই ধ্বংসের শক্তির জন্যই মানুষ আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যাকরীর মধ্যে হত্যার কামনা, নিহত হবার কামনা ও মৃত্যুর কামনা লক্ষ্য করা যায়।

-আত্মহত্যার চেষ্টাকরীদের মধ্যে তার মৃত্যুর পর কি কি পরিস্থিতি হবে, কার কি কি প্রতিক্রিয়া হবে, তার মৃত্যুর ফলে কে কে গুরুতর কষ্ট (শাস্তি) পাবে এসব বিষয়ে নানা রকম কল্পনা দেখা যায়। অনেকে এর মাধ্যমে নিজেকে শাস্তি দিতে চায়। অনেকে তার ভালোবাসার মানুষটির সাথে আবার মিলিত হবার আকাঙ্খা থেকে আত্মহত্যা করে। অনেকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যা করে। অনেকে পুনঃজন্ম লাভের আশায় আত্মহত্যা করে।

-অনেকের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যই এমন যে তারা খুব ঝোঁকে চলে। কিছু মনে হলে সাথে সাথে তা করতেই হবে এমনটা ভাবে। অগ্রপশ্চাত বিবেচনা নেই। এদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি থাকে।

-যাদের ঘর-বাড়িতে আত্মহত্যা করার উপাদান বেশী থাকে তারাও কিছুটা ঝুঁকিতে থাকে। যেমন, আমাদের দেশের কৃষকদের বাড়িতে কীটনাশক সহজলভ্য থাকতে দেখা যায়।

- মিডিয়ার, যেমন, পত্রিকার ও টেলিভিশনের ভুলভাবে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের মাধ্যমেও আত্মহত্যা উৎসাহিত হতে পারে। যেমন, বিখ্যাত কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর আত্মহত্যার খবর খুঁটিনাটিসহ ব্যাপক সহানুভূতি দিয়ে প্রচার করার পর তার ভক্তদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যায়। খারাপ মানুষদের দ্বারা উত্তক্ত হয়ে অমুক নামের নিরীহ একটি মেয়ে নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন খবর দিনের পর দিন প্রচার পাওয়ার পর একইভাবে উত্তক্ত আরেকটি মেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে।
- কিছু কিছু গবেষণায় আত্মহত্যার পিছনে জ্বীনগত ভিত্তি পাওয়া গেছে। পরিবারের মধ্যে আত্মহত্যার ইতিহাস থাকলেও এই ঝুঁকি বাড়ে। পরিবারের কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করলে বা আত্মহত্যা করলে তার সন্তানদের মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করার সম্ভাবনা বেশী থাকে। একই ডিম্বাণু থেকে জন্মানো যমজদের একজন আত্মহত্যা করলে আরেকজনও আত্মহত্যা করার ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এই ঝুঁকি ভিন্ন ডিম্বাণু হতে জন্মানো যমজদের মধ্যে কিছুটা কম থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, যদি একই ডিম্বাণু থেকে জন্মানো একজন যমজ আত্মহত্যার জন্য চেষ্ট করে তবে তার যমজটির মধ্যে আত্মহত্যা করার ঝুঁকি ১৭.৫ গুণ বেশী থাকে। আত্মহত্যার পিছনে মস্তিষ্কে সেরোটনিন (serotonin) ও নরএপিনেফ্রিনের (norepinephrine) ঘাটতিকে দায়ী করেছেন গবেষকেরা।

আত্মহত্যার সতর্ক সংকেতঃ সাবধান হবেন যখন কেউঃ

- মরে যাবে, সবার থেকে অনেক দূরে চলে যাবে এমনটা বলতে শুরু করে
- সবার থেকে ক্ষমা চায়
- বিদায় চায়
- আত্মহত্যার পরিকল্পনার কথা বলে
- আত্মহত্যার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাড় করে। যেমন, ঔষধ যোগাড় করলো
- যদি কেউ আত্মহত্যা কিভাবে করবে তার অনুশীলন বা রিহার্সল করে ও আন্তরিকভাবে আত্মহত্যা করার মতো সাহস বাড়াতে চায়
- ঘুম ও খাওয়া দাওয়া কমে গেলে, আচার-আচরণে সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটলে তা ঝুঁকি নির্দেশক হতে পারে
- নিজের চেহাড়া ও পোষাক আশাকের সৌন্দর্য্যের বিষয়ে অসচেতন হয়ে উঠে
- আত্মবিশ্বাস কমে গেলে
- নিজেকে ঘৃণা করে। ঘনিষ্টজনদের দূরে ঠেলে দেয়। নিজেকে অন্যের উপর বোঝা মনে করে
- অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। বিরক্তি বেড়ে যায়
- কেউ কেউ ধূমপান বাড়িয়ে দেয়। অনেকে মদ্যপান বা নেশাগ্রহণ বাড়িয়ে দেয
- নিজের জিনসগুলো দান করতে শুরু করে

- বড় ধরণের কোন সমস্যার মাঝে পড়ে ও বলে সে আর পেড়ে উঠছেনা। যেমন, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে তীব্র মানসিক কষ্টে পড়ে গেলে
- আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এমন মানুষ। বিশেষতঃ যদি আত্মহত্যার নোট লিখে চেষ্টা করে থাকে, যদি এমন ভাবে চেষ্টা করে থাকে যাতে কেউ তার চেষ্টার বিষয়টি ধরতে না পারে যাতে মৃত্যু নিশ্চিত হয় তাহলে
- কারো নিজের ক্ষতি নিজে করার ইতিহাস থাকলে। যেমন, কেউ যদি নিজেকে নিজে আহত করে
- জটিল দূরারোগ্য ব্যধীতে আক্রান্ত মানুষ
- বিষন্নতা, বর্ডারলাইন পারসোনালিটি ডিজঅরডার ইত্যাদি মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে, বিশেষতঃ আশাহীন হয়ে পড়লে

আত্মহত্যার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচঃ

- বিবাহ, সন্তান ও ভালোবাসাপূর্ন পারিবারিক সম্পর্ক,
- জোড়দার সামাজিক সম্পর্ক
- আত্মনিয়ন্ত্রণ ভাল থাকা
- পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের সন্মানহানির কারণ বা ক্ষতির কারণ হবার ভয়
- ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মচর্চা
- পেশায় নিয়োজিত থাকা
- ইতিবাচক চিন্তা করা

করণীয়ঃ

-আত্মহত্যার চেষ্টা করলে সাথে সাথে ডাক্তারী সেবা নিশ্চিত করুন। ডাক্তার যেভাবে ব্যবস্থাপত্র দেন সেভাবে অনুসরণ করুন, প্রেসক্রিপশন নিরাপদে সংরক্ষণ করুন ও রোগী ঔষধ খাচ্ছে ও নিয়ম মানছে তা নিশ্চিত করুন।

- আত্মহত্যার চেষ্টাকারীর দিকে চব্বিশ ঘন্টা নজারদারী বজায় রাখুন। একা ঘরে ঘুমাতে দেবেননা। রুম এমনকি টয়লেটের ছিটকিনি ও তালা অকেজো করুন যাতে ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে না পারে। তার সাথে যারা বসবাস করছে তারা যাতে তার আত্মহত্যাপ্রবণতার কথা জানেন ও সাবধান থাকতে পারেন তা নিশ্চিত হোন।

- শরীর কিছুটা ঠিক হলে তাকে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। প্রয়োজনে মানসিক হাসপাতালে মাস খানেক ভর্তি করে রাখুন। ভর্তি রাখতে অস্বস্তি বোধ করবেননা। আপনি জীবন রক্ষার চেষ্টা করছেন। মানসিক হাসপাতাল বলে লজ্জিত বা দুঃখিত হবেননা।

-তাকে মানসিক সমর্থন দিন। তার সমস্যাগুলো জেনে নিয়ে যতটুকু পারা যায় সমাধান করে দেবার চেষ্টা করুন। সমাধানযোগ্য না হলে তাকে জানান যে এই বিপদের দিনে তার সথে আপনি আছেন। তার সাথে ভাল ব্যবহার করুন। ভুলেও আত্মহত্যার চেষ্টা নিয়ে কটাক্ষ করবেননা। উস্কানিমূলক কিছু বলবেননা। তার দুঃখের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কোন উপদেশ দিবেননা। শুধু শুনে যান।

- কিছুটা কথা বলার মতো অবস্থা হলে তাকে সাইকোথেরাপি দেয়ার ব্যবস্থা করুন। সাইকোথেরাপি হলো এক ধরণের কথার চিকিৎসা। নানা ধরণের সাইকোথেরাপি প্রচলিত আছে। কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি (সিবিটি) এবং ডায়ালেকটিক্যাল বিহেভিয়র থেরাপি (ডিবিটি) আত্মহত্যার প্রতিরোধে বিশেষ ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়েছে। যদি পারিবারিক সমস্যা আত্মহত্যার সাথে জড়িত থাকে তবে সিস্টেমিক ফ্যামিলি থেরাপি বলে একধরণের ফ্যমিলি থেরাপী আজকাল সফল ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এদের চিকিৎসায় দলীয় থেরাপী বা গ্রুপ থেরাপীও সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কেউ যদি আত্মহত্যার চেষ্টা নাও করে, যদি তাকে আত্মহত্যার ঝুঁকিতে আছে এমন মনে করেন তবে তাকে সাইকোথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা করান। প্রয়োজনে মানসিক ডাক্তারও দেখান। সরকারী মেডিকেল কলেজের মানসিক বিভাগে, পাবনা মানসিক হাসপাতাল, ঢাকার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ও বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজের মনোরোগবিদ্যা বিভাগে এই সেবা পাওয়া যায়। দ্রুত চিকিৎসা দিন। জীবন শেষ হয়ে গেলে আর ফেরত আসবেনা।

- যদি কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করেই ফেলে তবে একটুও দেরী না করে তাকে উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বা নিকটস্থ যেকোন হাসপাতালে নিয়ে যান ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করুন।

-যদি বিষপান করে থাকে বা ঘুমের ঔষধ খায় তবে ডাক্তারের কাছে নেবার আগে বমি করাতে চেষ্টা করুন। সে যাতে ঘুমাতে না পারে সেই চেষ্টাও করুন। কালবিলম্ব না করে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হোন। ফাঁসী নিলে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস ফেরানোর চেষ্টা করতে পারেন। মুখে মুখ লাগিয়ে ফু দিয়ে শ্বাস চালুর চেষ্টা করতে পারেন। সবথেকে বড় কথা ঘাবড়ে যাবেননা। যদি মাথা কাজ না করে তবে পরিবারের যার মাথা ঠান্ডা তেমন কারো সাথে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপ নিন। সময়ই জীবন। সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে আত্মহত্যার চেষ্টাকারী বেঁচে যেতে পারে।

-অনেক সময় আত্মহত্যার চেষ্টাকরীদের ঘনিষ্ঠজনদের এতো বেশী মানিসক চাপ হয় যে তাদেরও মনসিক সমর্থন দরকার হয়। প্রয়োজনে নিজেরা কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপি নিন।

- আপনার পরিবারের কারো যদি আত্মহত্যার ঝুঁকি থাকে তবে তাকে সমর্থন দেয়ার জন্য সর্বোচ্চ করবেন। তার যত্ন নিবেন, লক্ষ্য রাখবেন, মানসিক সমর্থন দিবেন, শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা নিখুঁত ভাবে করবেন। এরপরও যদি কোন দূর্ঘটনা ঘটেই যায় তবে তা মেনে নিবেন। নিজেকে অপরাধী ভাববেননা। মনে রাখবেন জীবনের অনেক কিছুই এমনকি সব থেকে সফল মানুষেরাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা।

আত্মহত্যার চেষ্টাকরীদের করনীয়ঃ

-চিকিৎসা নিন। ভাল থাকুন। মানসিক ডাক্তার দেখান। ঔষধ খান। নিয়মিত সাইকোথেরাপি নিন।

- খুব বেশী মরে যেতে ইচ্ছা হলে পরিবারের সদস্যদের, বন্ধুদের বলুন। তদের সমর্থন নিন।

- ধৈর্য্য ধরুন।

-ধর্মের পথে থাকুন।

-ইতিবচক চিন্তা করার চেষ্টা করুন।

-তারপরও মরে যেতে ইচ্ছা হলে সাহায্যের জন্য ফোন করতে পারেন 'কান পেতে রই' (০১৭৭৯৫৫৪৩৯১, ০১৭৭৯৫৫৪৩৯২, ০১৬৮৮৭০৯৯৬৫, ০১৬৮৮৭০৯৯৬৬, ০১৯৮৫২৭৫২৮৬ এবং ০১৮৫২০৩৫৬৩৪) নামের স্বেচ্ছাসেবী একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্যদেরকে ফোন করতে পারেন। এরা ফোনে কাউন্সেলিং সেবা দিয়ে থাকে।

বলুনতো কেন আমরা নিজেদেরকে নিজেরা মেরে ফেলবো? এতো সুন্দর এই পৃথিবীটা। এতা সুন্দর আমাদের দেশ। মানবজন্মটাই সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত উপহা। একটা মাছিও আমরা তৈরী করতে পারিনা। নিজের এই আশ্চর্য অস্তিত্ব যত্ন করে টিকিয়ে রাখা কি আমাদের দায়ীত্ব নয়? কত ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরী হয়েছে। চিকিৎসা নিন। ভাল থাকুন। জীবন হোক মধুময়। জীবনের জয়গানে ভরে উঠুক চার দিক। ১০ সেপ্টেম্বর হলো বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস। এমন দিন আসুক যেদিন আমাদের আর এধরণের দিবস পালন করতে না হয়।

লেখকঃ মোঃ জহির উদ্দিন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। লেখাটির বিষয়ে মতামত দিতে লেখককে ই-মেইল করতে পারেন zahirm_bd@yahoo.com এই মেইলে।